# স্কন্দকাটা ভানু সর্দার

## সমুদ্র বিশ্বাস

সেকি! তুমি তো ভূত-প্রেত কিছুই মানতে না? যুক্তিবাদী অঙ্কুশ ভূত গবেষক হয়ে গেলে লোকে বলবে কি? চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে পাশের চেয়ারে বসে নিজের কাপটি তুলে নেয় হাতে। কথাগুলোর মধ্যে যে রহস্য মোড়া তা তনুর চোখেমুখে লেগেছিল। আমি মোটেও ভূত-গবেষক নই। চায়ের কাপ ঠোঁটে ঠেকায় অঙ্কুশ। তবে কেউ কেউ ভূত গবেষক হলে ক্ষতি কি? চায়ে চুমুক দিয়ে অঙ্কুশ গর্বস্বরে বলে—আমার গবেষণা কলকাতার রাস্তা-ঘাটের অতীত অবস্থান।

তুমি যে বললে কলকাতার জনবহুল শহরে ভূত। স্কন্দকাটা, হ্যাঁ স্কন্দকাটাই তো বললে। তনুর কথাকে সমর্থন জানিয়ে অঙ্কুশ বলে—বলেছি তো। কলকাতা শহর বলেছি। স্কন্দকাটাও বলেছি। তবে? আচ্ছা স্কন্দকাটা কি? ভূত, না পেত্নী। এরকম নামই বা কেন? তনুর জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে অঙ্কুশ বলে, নাম শুনেই বোঝা উচিত, এই ভূত মুণ্ডুহীন। মাথাহীন দেহ আর কী! কোনও অপঘাতে যদি কারো মাথা কাটা যায়, তবে তারাই স্কন্দকাটা হয়। এরা খুব ভয়ংকর ভূত এবং ক্ষতিকারকও। লম্বা লম্বা দুটো হাত বাড়িয়ে এরা চলাফেরা করে। চোখে দেখতে না পেলে কী হবে, কোনও মানুষের অস্তিত্ব যদি এরা কোনওভাবে টের পায়, তা হলে আর তার রক্ষা নেই।

সর্বনাশ! মুণ্ডুহীন ধড় ঘুরে বেড়ায়! এরা থাকে কোথায়? ভয়ার্ত গলায় তনুর জিজ্ঞাসা।

চা শেষ করে অঙ্কুশ। তারপর বলে—স্কন্দকাটা বিভিন্ন জায়গায় থাকে, কখনও গর্তে, আবার কখনও বা জলাভূমিতে। ঘন ঝোপঝাড়ও তাদের খুব পছন্দের জায়গা। এরা সব সময় নিজেদের কাটা যাওয়া মাথা খুঁজে বেড়ায়। সুযোগ পেলে মানুষ পাকড়াও করে ভয় দেখিয়ে তাকে দিয়ে নিজের মুণ্ডু খুঁজে বেড়ায়।

বুঝলাম। তা জলাজঙ্গল ছেড়ে স্কন্দকাটা কলকাতা শহরে কেন? তোমার গবেষণায় ভূত-প্রেতের সম্পর্ক এলো কোথা থেকে? তনুর প্রশ্নজালে খানিকটা

ইতস্তত বোধ করে অঙ্কুশ। তারপর বলে, কি মুশকিল, কলকাতার সব রাস্তা তো জন্ম থেকে ইট-বালি-সিমেন্ট বা পাথরের নয়। কলকাতা এক সময় গ্রাম ছিল। জল-জঙ্গল, খাল-বিলে ভরপুর ছিল। ঘটনা তখনকার। তুমি তো জানো—

বিবাদীবাগের কাছে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে রয়েছে সেন্ট জনস্ চার্চ। কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের এই পাথুরে গীর্জা তৈরি হতে সময় লাগে তিন বছর। অর্থাৎ ১৭৮৪ থেকে ১৭৮৭ পর্যন্ত। গ্রীক স্থাপত্য রীতিতে তৈরি এই গীর্জার মেঝের পাথর এসেছে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ এবং সুদূর চুনার থেকে। এই জমি দিয়েছিলেন তৎকালীন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজা নবকৃষ্ণ দেব। এখানেই রয়েছে আধুনিক কলকাতার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক ও তাঁর কন্যাদের সমাধি। এখানেই রয়েছে জগদ্বিখ্যাত 'লাষ্ট সাফার' ছবিটির অনুলিপি। আজকের কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট ১৭০৭ সাল নাগাদ অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময়ও এখানে ছিল একটি বড় খাল বা উপনদী, যে কিনা গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। এই বাঁধের খালের ওপর দিয়ে সন্ধের পর থেকে চলা-ফেরা করার মতো কারো বুকের পাটা ছিল না। কেননা এখানে তখন লোকবসতি যেমন কম ছিল তেমনই ছিল ঠ্যাঙাড়ে ও ডাকাতের উপদ্রব। ছোট ছোট গোলপাতার ছাউনি দিয়ে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে জেলেরা বাস করতো। অস্থায়ী কিছু বেদে-বেদিনীও বাস করতো। এই জল-জঙ্গলের মাছ ও বন্য সাপ-ব্যাঙ ধরে ধরে খেত।

একবার হঠাৎ গঞ্জের কোলবাবুদের বাগান পাহারাদার সুবল ঢালি নামে একটি বছর পঁচিশের ছেলে বৃদ্ধা মায়ের অসুখের খবর পেয়ে সোজা চলে এলো এই আজকের কাউন্সিল স্ট্রিটে, তখন এই জায়গার নাম ছিল বড় খাল পাড়। সময় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। মেঘলা আকাশ। সঙ্গে টাকা-পয়সা সবই ছিল তার। এই বড় খাল পাড় থেকে ওদের গ্রাম আরও তিন মাইল পায়ে হাঁটা পথ। পার হতে হবে বড় খাল পাড়ের বাঁধ। গ্রামের ছেলে হাঁটতে অসুবিধা নেই। কিন্তু জনরব দস্যু-ডাকাতের ভয়, ভয় আছে ভূত-প্রেতেরও। সুবল শেষমেশ যা থাকে কপালে ভেবে বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটছে তো হাঁটছে। বেনুপুকুর পার করে যেই বড় খাল পাড়ের দিকে তাকিয়েছে, অমনি বাঁ-দিকের ঝোপে একটি বনকুঁয়ো এমনভাবে ডানা ঝাঁপটালো আচমকা বুকে একটা ঝটকা লাগে সুবলের। নিজেকে সামলে নেয় সে। আবার হাঁটতে থাকে। এইভাবে বাঁধের কাছে আসতে না আসতেই সুবলের বুক শুকিয়ে গেল। সে দেখল কেউ একজন লণ্ঠন হাতে বাঁধ পার হয়ে পাড় ধরে এগিয়ে

যাচ্ছে। সুবলের মনে হল, ওকে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলছে। একবার ভাবল ওকে ডেকে একসঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে যাবে কিনা। লণ্ঠনটা পরিষ্কার বোঝা গেলেও মানুষটার অবয়ব পরিষ্কার ধরা পড়ছিল না। তাই সতর্কভাবে দূরত্ব বজায় রেখে পিছু নেওয়াটাই ঠিক মনে হল সুবলের। ভূত-প্রেতের ভয়টাই জাকিয়ে বসছিল তার মনে। শরীর ভারি হয়ে উঠছিল। পরিবেশও ছিল ভারাক্রান্ত। সন্ধ্যার আকাশ তো নয় নিকষ রাত্রি। গুটি কয়েক জোনাকি আর হাতের দোলনে কাঁপা কাঁপা লণ্ঠনের আলো, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আর ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাং ডাকে ওই অঞ্চলটি ভয়াবহ মায়াময় হয়ে উঠেছে। বাঁধে পা রাখতেই সে বুঝল-লণ্ঠন হাতে লোকটির সমস্ত শরীর চাদরে ঢাকা। শুধুমাত্র লম্বা লম্বা পা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সুবলের মনে ভয় ধরল। ধরবে নাইবা কেন? লোকটি যে মানুষ নয়, তা বুঝতে বাকি রইল না সুবলের। আর সেইজন্যই সে হাঁটার গতি কমিয়ে দিল। হঠাৎই পাশের জঙ্গল থেকে তারস্বরে একদল শিয়াল ডেকে উঠল হুক্কা-হু...য়া...। কেঁপে উঠল সুবল। ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। লোকটা এবার খ্যান খ্যান স্বরে বলল, 'আঁয় নারে, আঁয়'। সুবল পুরোপুরি বুঝতে পারল ডাকাত নয়, সে ভূতের খপ্পরে পড়েছে। ও টের পেল, ওর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমস্রোত নেমে আসছে।

এতক্ষণ অঙ্কুশের কথাগুলো নিষ্পলক দৃষ্টিতে শুনছিল তনু। এবার মুখ খুলল—এই সত্যি করে বলতো, ঘটনাটা কি তোমার বানানো? নাকি সত্যি। যদি সত্যি হয়, তবে তুমি জানলে কোথা থেকে? অঙ্কুশ একটু বিরক্তির সুর এনে বলল, তোমার না, প্রশ্ন আর প্রশ্ন? দিলে তো মাঝখানে প্রশ্ন নামক নাকটাকে গলিয়ে। নাক গলানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে নাক তো গলাব। তনুর কথার রেশ ধরে অঙ্কুশ বলে, কথাটা মনে রেখো। আমাকে যেন আর বলতে বলো না। আমি আর বলতে পারব না। সকাল থেকে এক কাপ চা খাইয়ে রেখেছো। আচ্ছা তোমারও কি খিদে পায়নি?

পেয়েছে বলেই তো নাক গলালাম। দাঁড়াও খাবার নিয়ে আসছি। কাপ দুটো নিয়ে অন্যঘরে চলে যায় তনু।

অঙ্কুশ উঠে দাঁড়াতে জানলার কাছাকাছি একটি গাছে রোজকার মতো একটা কাক এসে বসে। কা-কা করে দু-বার ডেকে তার উপস্থিতি জানান দেয় সে। প্রতিদিন এই সময় আলুভাজা বা কোনও সব্জির সঙ্গে গরম গরম রুটি খায় অঙ্কুশ। আর তার খাবার থেকে অল্প অল্প অংশ কাকটাকে দেওয়ার জন্য কার্নিশে

ছুড়ে মারে। কাকটা রোজই এইসময় উড়ে এসে খুঁটে খায় অঙ্কুশের দেওয়া খাবারের টুকরোগুলোকে। কাকটা দু-বার উড়ে এসে ঘুরে গেল কার্নিশের পাশ দিয়ে। কাকের হতাশ প্রয়াস দেখে বেশ কষ্ট অনুভব হল অঙ্কুশের। এগিয়ে গিয়ে জানলা ধরে গাছের দিকে তাকালো সে। কোথাও দেখতে পেল না। নিজের অভ্যাসমত সময় পার হয়ে যাওয়া খিদের চাপ, নিরীহ কাকটার ক্ষেত্রে ঠিক কেমন হতে পারে ভেবে নিজের মধ্যে একরকম অপরাধবোধ জাগ্রত হল। কেননা কাকটার এই সময়ে খাবারের অভ্যাস অঙ্কুশেরই বানানো।

একটি বাটিতে গরম দুধে চিড়ে ভিজিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে তনু ঘরে ঢোকে। আগের মতো চেয়ারে বসে। অঙ্কুশ এগিয়ে এসে বাটি ধরে বলে, একি, দুধ-চিড়ে।

মাঝে মাঝে রুচি বদলানো ভালো। তনুর উত্তরটা একটু বক্র ছিল কিনা বুঝতে পারে না অঙ্কুশ। শুধু বলে, সে না হয় বদলালাম। কিন্তু তুমি তো জানো তনু, এই সময় আমি শুধু নিজে খাই না। আমার খাবার থেকে কয়েক টুকরো খাবার আমি অন্য কাউকে খাওয়াই। তা কে বারণ করেছে? খাওয়াও না। তারও রুচির বদল হবে। অন্যঘরে বেরিয়ে যায় তনু।

দুধ-চিড়ে খাবে! তোমার কি হয়েছে বলতো—খানিকটা তনুর পিছু নেয় অঙ্কুশ। ওঘর থেকে তনু উত্তর দেয়—এখনো কিছু হয়নি, তবে এভাবে চলতে থাকলে এরপর অনেক কিছুই হবে। গতকালও বলেছিলাম আটা ফুরিয়ে গেছে। চিড়েও আর নেই।

ও তাই বলো। তাই তো ভাবছি, হঠাৎ কি হল যার জন্য তনু ম্যাডামের মেজাজ গরম।

মেজাজ আরও গরম হবে যদি কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের ভূতের ঘটনাটা পুরো না বলো। দুপুরে রান্না বন্ধ। রাতেও উপোস। কথা বলতে বলতে গোটা চারিক বিস্কুট দেয় অঙ্কুশের হাতে। জানলার ধারে গিয়ে চামচ দিয়ে বাটিতে একটু শব্দ করে তারপর বিস্কুট চারটি ছুড়ে মারে কার্নিশ লক্ষ্য করে। আশপাশে কোথাও কাকটা ছিল। সে ছোঁ মেরে শূন্য থেকেই একটা বিস্কুট ঠোঁটে ধরে নেয়।

কিন্তু ম্যাডাম বলার আর মুড নেই। তাছাড়া কতদূর বলেছিলাম তাও মনে নেই। রাতে বললে হবে না? অঙ্কুশের জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে তনু বলে, না হবে না। তোমাকে এখনই বলতে হবে। তা না হলে রান্না-বান্না সত্যি সত্যি বন্ধ। কতদূর বলেছিলে তা যদি তোমার মনে না থাকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। একটু

চিন্তার ভাঁজ পড়ে তনুর কপালে। হ্যাঁ ওই ভূতটা খ্যান খ্যান স্বরে বলল, 'আঁয় নারে, আঁয়।

ভালোই তো নকল করতে পারো। অঙ্কুশের খোঁটা দেওয়াকে কাজে লাগায় তনু। সে বলে, কলেজে নকল চলন-বলনে আমার সুনামের কথা তোমার মনে থাকা উচিত ছিল। যাইহোক, আর কথা বেশি বাড়িও না। তারপর কি হল বলো—

কি আর হবে। ভয় চেপে রেখে একটু জোরের সঙ্গে সুবল বলল, কে তুমি? আমাকে সঙ্গে নিয়েছো কেন?

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ওঠে লোকটি, সে হাসি আর থামে না। যেন সর্দিভরা গলা। হাসির রেশ ধরেই ঘড় ঘড় গলায় বলল, ভয় নেইরে। আঁয় না রে। আমার সঙ্গে আঁয়। সুবল সম্মোহিতের মতো চলতে লাগল লোকটার পিছনে পিছনে। বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর সে দেখল অন্ধকারে কয়েকটি ছায়া শরীর পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখের ভেতর থেকে লাল-নীল টুনির মতো আলো জ্বলছে।

ছায়ামূর্তিগুলো একসঙ্গে বলল, এখান দিয়ে রাত্রিবেলা কে যায়রে? লণ্ঠন হাতে লোকটি বলল, ওকে যেতে দে।

একটা ছায়া শরীর দু-পা এগিয়ে এসে বলল, কাল সকালে এলেই পারত। আমাদের চলার সময় কেন এলো জিজ্ঞেস কর?

লোকটি বলল, ওর মায়ের খুব অসুখ।

ভয়ে সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল সুবলের। ওর মায়ের শরীর খারাপ একথা ওই লোকটি কী করে বুঝল।

ছায়া শরীর বলল, ওর মায়ের অসুখ তাতে তোর কী? প্রশ্ন করা মাত্র লণ্ঠন হাতে লোকটি হঠাৎ জোরে ফুঁ দিল, একটা আগুনের গোলা যেন ছুটে গেল ছায়া শরীরগুলোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিগুলো ঝাপসা হতে হতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কি করবে ঠিক করতে পারে না সুবল। অগত্যা বাঁধের দিকে দৌড়াতে থাকে। ভয়ে কাঠ হয়ে আসে তার শরীর। জনমানব শূন্য বিল জঙ্গলে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ক্রমশ মায়াময় পরিবেশকে ভয়ার্ত করে তুলছিল। যেই না বড় খাল পাড়ের বাঁধে উঠেছে অমনি গাড় অন্ধকার চিরে বেরিয়ে এলো একদল মূর্তি-মানুষ। নানান চেহারার মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে। সুবলের বুঝতে দেরি হল না যে সে ভূতের নয়, ডাকাতের খপ্পরে পড়েছে। সুবল হাত জোড়

করে বলল, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমার মায়ের খুব অসুখ।

মূর্তি মানুষগুলো হো হো করে হেসে উঠল। তারপর একসঙ্গে বলল, মৃত্যু না থাকলে কেউ এই রাতে এখানে আসে? আবার সবাই হো হো করে হেসে উঠল। তারপর খ্যান খ্যান গলায় একসঙ্গে বলে উঠল এই রাতে কেউ এখানে আসে। কেউ এখানে আসে। ভৌতিক পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করছিল ডাকাত দলটি। ডাকাত সর্দার এখানে ভূত সর্দারের ভূমিকায় ভালোই অভিনয় করছে। সর্দার সবাইকে বলল, এই চুপ কর। সকলে চুপ হলো।

সুবল আবার হাত জোড় করে বলল, আমার যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও সর্দার।

সর্দার আমাকে ছেড়ে দাও সুবলের নকল করে সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠে।

সর্দার আবার বলল, এই চুপ কর। চুপ করল সবাই। তারপর বলল, তোকে ছেড়ে দেব? তোকে ছেড়ে দেওয়া মানে আমাদের মানে ভূতদের জীবনলীলা শেষ। যা তোকে ভূত বানিয়ে দিই, বলেই হাতের বল্লমটা সজোরে ছুড়ে দেয় সুবলের বুক লক্ষ্য করে। সুবল খপ্ করে ধরে ফেলে বল্লমটা। তারপর খুলনার হারু লাঠিয়ালের কাছে শেখা লাঠি মানে বল্লমটা ঘোরাতে থাকে বন বন করে। মূর্তি ভূতগুলো নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পড়ে থাকে মাটিতে। দু-তিনজন মানুষের রূপ ধরে যন্ত্রণায় কাঁই কাঁই করতে থাকে। শুধু সর্দার ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে একটা বড় রামদা নিয়ে। কোপ মারতে যায় সুবলকে। নিজেকে সামলে নিয়ে রামদা কেড়ে নেয় সুবল। পাশে পড়ে থাকা একটা মোটা ডাল তুলে সজোরে বাড়ি মারতে যায় সুবলকে। সুবল ঘুরে গিয়ে রামদায়ের কোপ মারে সর্দারের ঘাড়ে। ধড় থেকে মুণ্ডু ছিটকে পড়ে সর্দারের। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে সুবল। রামদাটা বড় খালে ছুড়ে মারে। তারপর সোজা হাঁটতে থাকে বাড়ির দিকে।

পরদিন চারদিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে কোন এক লাঠিয়াল ডাকাত সর্দার ভানুর গোটা দলকে শেষ করে দিয়েছে। এই ঘটনার পর ওই বড় খাল বাঁধের নাম হয় লাঠিয়াল বাঁধ, যেখান দিয়ে শুরু হয়েছে আজকের কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট।

অঙ্কুশ এবার আড়মোড়া দেয় শরীরে। তারপর বলে, বুঝলে তনু, সেই থেকে আজও মুণ্ডুকাটা ভানু সর্দার তার কাটা যাওয়া মুণ্ডু খুঁজে বেড়ায়। তনু কী বলবে ভেবে পায় না। শুধু জানলার পাশ দিয়ে কা-কা করে উড়ে যাওয়া কাকটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ❑